রম্য-রচনা
ও
গল্প

ডঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

রম্য-রচনা ও গল্প

রম্য-রচনা

কি বিপদ !	অন্বেষা	২০১৭
গো - সম্পকৃত গল্প	অন্বেষা	২০১৭
টাক - কথা	অন্বেষা	২০১৬
জীবনের হিসাব	অন্বেষা	২০১৬
বিয়ে - কম	অন্বেষা	২০১৫
আত্মকথা	অন্বেষা	২০১৫
কো - আক	অন্বেষা	২০১৪
গল্পের গোরুর আসল উৎ**স**	অন্বেষা	২০১৪
ইজ ইট এ জোক ?	অন্বেষা	২০১৩
মহিষ কখন সিংহ খায়	অন্বেষা	২০১৩
তেল	জলসিঁড়ি	২০০৬

গল্প

একটি নীরস ঘটনা	অন্বেষা	২০২০
সংকেত	স্মরনিকা	২০১০
পাড়ি	ঝড়, পূজাবার্ষিকী	২০০৬
মেঘ - বৃষ্টি - রোদ্দুর	ঝড়, পূজাবার্ষিকী	২০০৫
উত্তরণ	কবিতার কাগজ, পূজাবার্ষিকী	২০০৩

কি বিপদ!

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

কোলকাতার এক ছুটির দিনের বাস। দুপুরবেলা। বাসে কয়েকজন মাত্র যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। বাকীরা বসে। বাসের দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন যাত্রী পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—

'ক... ক.... টা বে... বেজেছে দা..দাদা?'

অন্য যাত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

'দা... দ্দা, ক... ক্কটা বে.. বেজ্জেছে বো... ও... ওলবেন?'

কোনো উত্তর নেই।

যাত্রীটি তখন দ্বিতীয় যাত্রীর বাহুতে একটু ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'ও... ও দাদ্দা, ক:.. ক্ক টা বে... ব্বে...জেছে ব্ব... লতে প্পা... পা রেচ্ছেন ন...না?'

যথারীতি এরপরও দ্বিতীয় যাত্রী ভদ্রলোক নিরুত্তর। রেগে গজগজ করতে করতে যাত্রীটি একটু পরেই বাস থেকে নেমে গেলেন।

প্রথম যাত্রীটি বাস থেকে নেমে যাওয়ার পর দ্বিতীয় যাত্রী ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়ানো সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আপনাকে উনি এতোবার ক'টা বেজেছে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোনো উত্তর দিলেন না কেন? উনি রেগেমেগে নেমে গেলেন। ক'টা বেজেছে বলে দিলে কি এমন ক্ষতি হত আপনার?'

একথা শুনে বোধহয় আর থাকতে পারলেন না ভদ্রলোক। রেগে উত্তর দিলেন—

'মু...ম্মুখ খু... খুলি আ... আর মা... মার খাই আ... আর কি?'

রম্যরচনা

গো-সম্পর্কিত গল্প

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

আমাদের সঙ্গে ক্লাস ফাইভে পড়ত হাবু। হাবু এমনিতে ছিল খুব স্মার্ট, সমস্ত বিষয়েই তার এমন জ্ঞান ছিল যে সবার আগে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য করত। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে সে ছিল ভীষণ অলস, সবসময় স্টেজে মেরে দেওয়ার ব্যাপারে ছিল দারুণ আত্তবিশ্বাসী।

সেবার স্কুলের অ্যানুয়েলের বাংলা পরীক্ষার আগে বন্ধুরা সাজেশান করে সতেরোটা বাংলা রচনা মুখস্ত করেছি। হাবুকে জিজ্ঞাসা করতে বলল যে একটা রচনাই সে ঠিক করে মনে রেখেছে। বাকিটা পরীক্ষার হলে ম্যানেজ করে দেবে।

সেবার পরীক্ষায় এল 'নদী' রচনা। পরীক্ষার পর খেলার মাঠে হাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে, রচনা কি লিখলি?'

— কেন, নদী রচনা লিখলাম।

— কি করে? তুই তো নদী রচনা মুখস্ত করে যাসনি?

— ও! সে ঠিক ম্যানেজ করে নিয়েছি।

হাবুর দাদা বকু ছিল হাবুর চেয়ে তিন বছরে বড়। কিন্তু পর পর দুবার ফেল করে তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। বকু ভাইকে জিজ্ঞাসা করল—

— হ্যাঁরে, তুই কিভাবে ম্যানেজ করলি?

— কেন? লিখলাম— আমাদের গ্রামের পাশে বয়ে চলেছে একটি নদী। সেই নদীর দুই তীরে জন্মায় প্রচুর ঘাস, সেই ঘাস খেতে সেখানে তাই প্রচুর গোরু চরে বেড়ায়। গোরুর চারটি পা, একটি লেজ, মাথায় দুটো কান আর দুটো সিং আছে। গোরু লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায়। গোরুর চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়— এইসব। গোরুর রচনা তো আমার মুখস্থ ছিলই।

আমরা অবাক হয়ে হাবুর বুদ্ধি কথা আলোচনা করতে লাগলাম। তারপর সেদিন যে যার বাড়ী চলে গেলাম।

পরদিন ছিল রবিবার। তারপর সোমবার আবার খেলার মাঠে হাবুর সঙ্গে দেখা হল। হাবুর সঙ্গে ওর দাদা বকু।

বকুদা কথায় কথায় বলল— আজ আমার বাংলা পরীক্ষা ছিল। সেদিন হাবুর রচনা লেখার কথা শুনে আজ আমিও ঠিক ম্যানেজর করে নিয়েছি।

সমীরণ জিজ্ঞাসা করল— বকুদা, তোমার কি রচনা পরীক্ষাতে পড়েছিল?

— তোমার বাবা।

— তুমি কিভাবে ম্যানেজ করলে?

— কেন? আমিও হাবুর মতো ওর গোরুর রচনাটাই গতকাল সারাদিন ধরে মুখস্ত করেছিলাম। সেটাই লিখে দিয়ে এলাম।

— কি লিখলে?

— আমি লিখলাম, আমার একটা বাবা আছে। বাবার চারটে পা, একটি লেজ, মাথায় দুটো কান আর দুটো সিং আছে। বাবা লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায়। বাবার চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়— এইসব। একদম ঝাড়া মুখস্ত ছিল। ঝেড়ে লিখে দিয়ে এসেছি। এবারে আমার পাশ করা আটকায় কে?

<u>রম্যরচনা</u>

টাক-কথা

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

গুরুদেব মার্কণ্ড একমাত্র শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষকে লইয়া কাশীধাম যাইবার পথে শিষ্যের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেই কথোপকথনের একাংশ এখানে পরিবেশিত হইল।

শিষ্য— গুরুদেব, টাক কয় প্রকার ও কি কি?

গুরুদেব— হে পুণ্ডরীকাক্ষে! ভারতবর্ষীয় টাক চার প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে সর্বাধিক দৃষ্ট হইল দুখটাক, অর্থাৎ দুখী ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট টাক। ইহা মুখমণ্ডলের সম্মুখদিক হইতে শুরু হইয়া ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে পশ্চাতদিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার টাক হইল সুখ-টাক। ইহা সাধারণত সুখী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোলাকার। কিন্তু আয়তন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। চারিদিকে উদ্ভিদবেষ্টিত সরোবরের ন্যায় ইহা দীপ্যমান হয়। কোনো কারণে কেশ রঞ্জিত করিলে এই টাকাংশও কিঞ্চিত রঞ্জিত হইয়া থাকে। তৎকালে ইহার উজ্জ্বলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার টাক হইল টুক-টাক। অর্থাৎ মস্তকের বিভিন্ন স্থানে এক বা বহু ক্ষুদ্র হইতে মাঝারি আকৃতির টাক। সুখ-টাককে গগনের চন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে তারকাগণের সহিত তুলনা করিতে হয়। মহিলাদিগের মধ্যেও এই প্রকার টাক বর্তমান, কিন্তু কদাচিত দৃষ্ট। কারণ বৃহতাকৃতির কেশসমূহ ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে।

চতুর্থ প্রকার টাকের নামকরণ করা যায় 'স্মৃতিটুকু থাক' রূপে। ইহা মধ্য ও উচ্চবিত্ত বঙ্গবাসীগণের মধ্যেই সাধারণত দৃষ্টমান হয়। পূর্ণ মস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র অন্তিম ডান অথবা বাম প্রান্তে চারি হইতে চোদ্দটি কেশ বর্তমান থাকে, বাকী অংশ থাকে পূর্ণিমার উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কেশহীন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিগণ ঐ কয়টি কেশকে বহু যত্নপূর্বক বারংবার মস্তকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া থাকে। প্রত্যহ সপ্তম হইতে একাদশ বার আর্শির সম্মুখে এবং সপ্তদশ হইতে একদ্বিংশবার আর্শি ব্যতিরেকে উহাদিগের এইরূপ পরিচর্যা করা হয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগণের অতীত দিনের মস্তকভরা কেশের স্মৃতিতে এইপ্রকার কেশ-পরিচর্যা করা হয়, সেজন্য এইপ্রকার টাকের নামকরণ সার্থক।

রম্যরচনা

জীবনের হিসাব

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

এ হল সেই আদ্যিকালের কথা। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত। পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর জন্য সমস্ত জীব-আত্মা সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। হেডক্লার্ক চিত্রগুপ্ত ক'দিনের জন্য ক্যাম্প করে কাউন্টার খুলে বসেছেন। এবার জীব-আত্মাদের পরমায়ু দান করা হবে। বিভিন্ন জীবনকালের জন্য আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন মেয়াদের স্লিপ তিরণ করা হয়ে গেছে। এবার বিভিন্ন কাউন্টারে গিয়ে চিত্রগুপ্তের চেলাদের কাছে স্লিপ জমা করে পরমায়ু নথিভুক্ত করতে হবে। যদিও প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেছেন যে, এই পরমায়ু যে কোনো প্রজাতির জীবের জন্য মোটামুটি উচ্চতম সীমানির্দেশ করবে, তবে সেই প্রজাতির সবাই ততদিন বাঁচবে না। তবু জীব-আত্মাদের মধ্যে দারুন উত্তেজনা। এদিকে সারারাত ধরে আসব পান করে চিত্রগুপ্তের চেলাদের অনেক দেরি করে ঘুম ভেঙ্গেছে। হুড়মুড়িয়ে কাঁচা ঘুম ভেঙে এসে কাউন্টার খুলে বসতে হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে একই কাউন্টারে লাইন দিয়েছে ২০-১০০ বছরের পরমায়ুর স্লিপ পাওয়া অর্থাৎ ২টি থেকে ১০টি ১০ বছর মেয়াদের স্লিপ পাওয়া বিভিন্ন প্রজাতির জীব-আত্মা। তবে মানব জীব-আত্মা কূটবুদ্ধিতে সেদিনও ছিল অন্য সব প্রজাতির উপরে। কিন্তু তার হাতে আছে মাত্র ৪টি স্লিপ— অর্থাৎ ৪০ বছরের পরমায়ু। ধূর্ত মানব-আত্মা আরও কিছু পরমায়ু হাতানোর চেষ্টায় সামনে দেখতে পেল গাধা-আত্মাকে। তারও পরমায়ু ৪০ বছর পর্যন্ত।

মানুষ— এই গাধা, তোর 'ডিউটি চার্ট' দেখেছিস? সারাজীবন শুধু আধপেটা খেয়ে অন্যের বোঝা বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া! কাজের একটু এদিক-ওদিক হলেই পাবি নির্যাতন। এরকম করে তুই চল্লিশ বছর বাঁচবি? চ-ল্লি-শ বছর!

গাধা— তুমি তো ঠিকই বলছ গো! তাহলে কি করা যায়?

মানুষ— শোন। তুই তোর ঐ দশ বছরের দুটো স্লিপ আমাকে দিয়ে দে। তাহলে আর বুড়ো বয়স অবধি আমার বোঝা তোকে বইতেও হবে না, নির্যাতনও সহ্য করতে হবে না।

বোকা গাধা মানব-আত্মাকে তার দুটো স্লিপ দিয়ে দিল।

মানব-আত্মা খুব খুশি। ফোকটে ৬০ বছর অবধি বেঁচে থাকার স্লিপ পাওয়া গেল। কিন্তু মানব চরিত্র চিরকালই একইরকম, ধান্ধাবাজিতে সাফল্য এলে লোভ বাড়তেই থাকে। একটু পরেই তার নজরে পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুর-আত্মার উপর। সেও দাঁড়িয়ে আছে হাতে চল্লিশ বছর অবধি পরমায়ুর স্লিপ নিয়ে।

যথারীতি তাকেও মানুষ ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তার 'ডিউটি চার্ট'-এর ভয় দেখিয়ে আরও ২০ বছরের আয়ু জোগাড় করে নিল।

এরপর মানব-আত্মার নজরে পড়ল পাশের লাইনের দিকে। সেখানে একদম কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শকুনের আত্মা। তারও চল্লিশ বছরের আয়ু। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে যথারীতি তার কাছ থেকেও মানব-আত্মা জোগাড় করে নিল আরও ২০ বছরের আয়ু।

ইতিমধ্যে লাইন এগিয়ে গেছে অনেকটাই। কাউন্টারের সামনে পৌঁছে মানব-আত্মা চট্‌পট্‌ জমা করল ১০ বছরের ১০টি স্লিপ। লাল চোখে বেশি কিছু দেখা-বোঝার অবস্থায় ছিল না কাউন্টারে থাকা চিত্রগুপ্তের চেলার। কোনোকিছু না দেখেই মানুষের নামে ১০০ বছর অবধি পরমায়ু জমা করে দিল। মানব-আত্মার খুশি আর ধরে না!

এরপর পৃথিবীতে সব জীব জন্মাল। মানুষও জন্মাল। সেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা। আদিম মানব-আত্মার জোটানো আয়ু আমরাও ভোগ করি। কিন্তু সেই আদিম মানব-আত্মার জানা ছিল না যে, প্রতিটি জীবের আয়ুর সঙ্গে জীবের জীবনযাপনও যুক্ত করা ছিল। তাই আজও আমাদের চল্লিশ বছর বয়স অবধি— 'মানুষের জীবন', চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স অবধি 'গাধার জীবন', ষাট থেকে আশি বছর অবধি 'কুকুরের জীবন', আশি বছরের পরের থেকে শুরু হয় 'শকুনের জীবন।'

একটু হাসো

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

বিনোদ বিহারী মোদক নামের এক সুদখোর রেশন দেকানদার সুদের টাকা আর রেশনের চাল-গম বেচার টাকা জমিয়ে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। এরপর মোটা বরপনের লোভ দেখিয়ে তিনটি মেয়েকে তিন স্কুল শিক্ষকের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। ছোট মেয়ের বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজের দোকান ঘরের বাইরে খাটিয়ায় বসে বিড়ি খেতে খেতে সামনের খাটিয়া আর বেঞ্চিতে বসা অনুগ্রহ প্রার্থী কিছু খাতকের কাছে বক্তৃতা মারছিল। কথোপকথন ছিল এরকম ঃ-

প্রথম খাতক—বিনু কাকা, আপনার মেয়েগুলি কিন্তু খুব ভালো ঘরে পড়েছে। ভগবানের আশির্বাদে......

বিনোদ—কই আর ভালো বিয়ে হল রে!

দ্বিতীয় ঘাতক—কেন কাকা, বেশ তো তিনটে মাস্টার জমাই পেলে। বলতে নেই, জামাইগুলো সবাইতো দেখতে শুনতে ভালো। তাহলে?

বিনোদ—আরে মনোমত জামাই কই আর হল। বড় মেয়েটার ভালোই বিয়ে হয়েছিল। মেজোটারও যাই হোক খারাপ বিয়ে হয়নি। কিন্তু এই ছোট জামাইটার পড়াশোনা অনেক কম!

প্রথম খাতক—কেন? আপনার ছোট জামইওতো মাস্টারী করে, তাহলে.....

বিনোদ—তাতে কি? এই জামাইটার পড়াশোনা অনেক কম। সেজন্য আমর তেমন ইচ্ছে ছিল না। সবাই বলল, তাই....

চারজন খাতক একসঙ্গে—কি রকম?

বিনোদ—দ্যাখ, আমার বড়োজামাই বিয়ে বেশি পাস। মানে বিয়ের চেয়ে বেশি। মেজো জামাই বিয়ে পাশ। কিন্তু ছোট জামাইটা ঠিক বিয়ে পাশও নয় তো......

চতুর্থ ঘাতক—কেন কাকা? গ্রাজুয়েট না হলে মাস্টারী চাকুরী পেল কি করে?

বিনোদ—সে সব জানি না। তবে ছোট জামাই ভালো শিক্ষিত নয়, কেবল বিয়ে কম পাশ করেছে। মেজো জামাইয়ের থেকেও অনেক নিচে। বুঝলি না?

আপনারা কিছু বুঝলেন?

আম্রকথা

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

সেদিন তপনদার পাল্লায় পড়ে আমাদের অফিসের পাশের গাছ থেকে পাড়া কয়েকটা আম বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। আমগুলি বেশ বড় বড় সাইজের, এক-একটার ৩০০–৪০০ গ্রাম ওজন হবে। বেশ বয়স্ক আম, দু-একদিন বাড়ীতে রাখলেই পেকে যাবে মনে হল। এরপর কদিন কাজের চাপে আমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গতকাল ছিল রবিবার। শনিবার বিকেলে আমার সেজোমামা দেশের বাড়ী থেকে এসেছেন। সেজোমামা ভীষণ রসিক, খাদ্যরসিকও। সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, হঠাৎ হইচই শুনে দেখি আমার ছেলে শ্রীমান কৌস্তভ আঁ আঁ করছে, তারপর বার বার থু থু করছে আর বার বার বেসিনে কুলকুচো করে মুখ ধুচ্ছে। কি ব্যাপার? অনেক প্রশ্নের পরে বুঝলাম আমার ছেলে অফিসের পাশের আমগাছের সেই আম রেখেছিল চালের ডাব্বাতে। বেশ টুস টুসে হয়ে পেকে গেছে দেখে আজ সকালে একটা আম খেতে গিয়েছিল। ছেলে আমার একটু পেটুক টাইপের। তো, সেই আম একটুখানি গিলে ফেলতে গিয়েই এই বিপত্তি। এসব আলোচনা চলছে—এমন সময় দেখি আমার সেজোমামা সেই কাটা আম শুঁকে আর একটু জিবে ঠেকিয়ে বলল ''এতোদিনে খোঁজ পেলাম। এই আম আমার ঠাকুদ্দা ছেলেবেলায় একবার নিয়ে এসেছিলেন, আর আজ আবার দেখলাম। এর দেখা পাওয়াই ভার। তোরা কেউ এই আমের নাম জানিস?"

ইতিমধ্যে আমি ভয়ে ভয়ে একটু আম জিবে ঠেকাতেই মনে হল আমার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জিব আর মুখ ভালোকরে ধুয়ে সেজমামাকে বললাম—আমরা এর নাম জানিনা। তুমিই বলো। তবে এর নাম 'বেলগাছিয়াম' রাখা যেতে পারে, হাজার হোক বেলগাছিয়ার আম তো!

সেজমামা উত্তর দিল ''ধ্যুৎ, এর নাম হল কাক দেশান্তরী আম।"

আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম মানে?

সেজোমামা পাকা গোঁফের তলায় ফিচেল হাসি হেসে বলল ''এই আম একবার ভুল করে খেলে কাকও দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালায়। তাই এর নাম হল কাক দেশান্তরী আম।

বোঝো!

একটু হাসো

কো-আক্

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

এ গল্প বেশ কিছুদিন আগের। তখন যতবার খুশী ম্যাট্রিকুলেশন (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় বসা যেত। খগেন পরপর সতেরো বার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরও পাশ করতে পারল না। শেষবারে সমস্ত বিষয় মিলে এগারো নম্বর পেল। তখন খগেনের বাবা নগেনচন্দ্র খুব রেগে গেলেন। এদিকে একমাত্র ছেলের দাড়িতে পাক ধরা শুরু হয়ে গেছে, অথচ বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে খগেনের মা মোক্ষদাসুন্দরীও খগেনের বাবার উপর রেগে গিয়ে যা মুখে এল তাই বলে গালাগালি দিতে লাগল। সব দেখেশুনে নগেনবাবু স্কুলের কর্মশিক্ষার শিক্ষক প্রতিবেশি খাঁদু পালের কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। খাঁদু-মাস্টার বুদ্ধি দিল যে তার শালার কাছে কিছুদিন থেকে যদি হাতুড়ে ডাক্তারীটা শিখতে পারে, তাহলে খগেনের ভাত মারে কে? সুতরাং খগেনকে যথারীতি খাঁদু পালের শালা প্রখ্যাত হাতুড়ে ডাক্তার যাদবেন্দ্র তা ওরফে যদু ডাক্তারের সাগরেদি করতে পাঠানো হল।

যদু ডাক্তার রোগী দেখতে যাচ্ছেন, সঙ্গে খগেন। কথা হয়েছে রোগী দেখে ফেরার পরে রোগ নিয়ে আলোচনা করে সব শিখে নেবে খগেন। রোগীটি ছিল ক্রনিক অম্বল-আমাশা ভোগী। এসব ক্ষেত্রে যা হয়—রোগী পথ্যের কোন নিয়ম মানে না। রোগীর বাড়ি পৌঁছে রোগীকে দেখে-টেখে যদু ডাক্তার আচ্ছা করে ধমক লাগালেন। বললেন,

'আমার কথা না শুনলে চিতার কাঠ কাটুন, আমাকে আর ডাকবেন না।"

—"ডাক্তারবাবু, আমি তো আপনার সব ঔষধই খাই, সব কথা শুনি।"

—"মোটেই না। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে চপ-মুড়ি একদম খাবেন না। আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে চপ-মুড়ি খান। ইয়ারকি হচ্ছে?"

অনেক বকাবকি, উপদেশ, রোগীর স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে একটা অম্বলের ওষুধ লিখে দিয়ে যদু ডাক্তার ভিজিটের টাকাটি পকেটে পুরে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফেরার পর যথারীতি খগেন জিজ্ঞাসা করল,

—"ডাক্তারবাবু, আপনি কি করে বুঝলেন যে রোগী চপ-মুড়ি খেয়েছে?"

—"আরে বাড়ির গলির সামনেই তো চপ-মুড়ির দোকান। আর রোগীর খাটের তলায় মুড়ি পড়েছিল কয়েকটা। তাই দেখে বুঝে নিলাম সবকিছু।"

এর কদিন পরে যদুবাবু বিশেষ কারণে শ্বশুরবাড়ি গেলেন। অন্যসময় যদুবাবু না থাকলে চেম্বার বন্ধ থাকে, কিন্তু খগেন বলল যে সে চালিয়ে নেবে। তাই চেম্বার বন্ধ করার দরকার নেই। এরপর সেইদিন বিকেলবেলা খবর এল সেই অম্বল-আমাশা রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থা। যদু ডাক্তার নেই, তাই জুনিয়র ডাক্তারবাবু খগেনকে রোগীর বাড়ির লোক ডেকে নিয়ে গেল। খগেন গিয়ে রোগী দেখার পর রোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে একটু পায়চারী করে ফিরে এল। এরপর খগেন রোগীকে আর রোগীর বাড়ির লোককে আচ্ছা করে বকাঝকা শুরু করে দিল। সবাই বলল,
—"ডাক্তারবাবু, রোগীতো আর চপ-মুড়ি খায়না। তাহলে এত বকাবকি করছেন কেন?"

—"আবার কথা। নিয়ম মেনে খাওয়া দাওয়া করতে বলা হয়েছিল না!"

—"তাইতো করছি ডাক্তারবাবু", রোগী বলল।

—"তাই নাকি? ইয়ারকি হচ্ছে? লুকিয়ে লুকিয়ে জুতো খাচ্ছেন আপনি। আপনার বাড়ির গলির সামনে জুতো দোকান, আর আপনার খাটের তলায় তিনজোড়া জুতো!"

গল্পের গোরুর উৎস

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

('গল্পের গোরু গাছে ওঠে' প্রবাদটি সবাই জানেন। এই প্রবাদটির উৎস কেউ জানেন কি? জানেন না তো? আজ জেনে নিন)।

একটি শান্ত-শিষ্ট গোরু মাঠে চরে চরে ঘাস খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। মাঠের প্রান্তেই ছিল এক ঘন জঙ্গল। এমন সময় সেই জঙ্গল থেকে বেরোল এক ক্ষুধার্ত বাঘ। বাঘের যা স্বভাব—চুপি চুপি গোরুর পেছনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। উদ্দেশ্য—গোরুটিকে শিকার করে খাওয়া। ঘাস খেতে খেতে গোরুটি গন্ধ পেল বাঘের, আর ঘাড় ফিরিয়ে বাঘ দেখেই সে চোঁ চোঁ করে সোজা দৌড় লাগাল। সামনেই ছিল এক উঁচু তালগাছ। প্রাণের ভয়ে গোরুটি তড়িঘড়ি করে তালগাছে চড়ে একদম মগডালে গিয়ে বসে থাকল। গোরুকে তাড়া করে বাঘ তালগাছ অবধি এসেও ধরতে পারল না, দু-একবার গাছে চড়ার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু সেজন্য বাঘ কিন্তু হতাশ হল না। সে তালগাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল, আর বলতে লাগল "ব্যাটা গোরু, গাছ থেকে তো তোকে নামতে হবে। একবার নাম, তারপর দেখাচ্ছি মজা।"

এদিকে গোরুতো গাছের তলায় বাঘ দেখে মোটেই নামতে রাজী নয়। এভাবেই কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। এরপর একসময় গোরুটির প্রস্রাব পেল। গাছে চড়া অবস্থাতেই সে প্রস্রাব করতে শুরু করল। গোরুর প্রস্রাব সুতোর মতো আকার নিয়ে নিচে পড়তে লাগল। সেই প্রস্রাব সুতো ধরে ধরে বাঘ ঝুলে ঝুলে উপরে উঠতে লাগল। উদ্দেশ্য—একবার গোরুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেই কেল্লা ফতে করে দেবে। বাঘ সেই প্রস্রাব-সুতো ধরে ধরে গোরুর একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল—আর একটু পরেই গোরুকে ধরে নেয় আর কি! এমন সময় গোরুর চোখ পড়ল বাঘের দিকে। ভয়েই তার প্রস্রাব পড়া বন্ধ হয়ে গেল। প্রস্রাব-সুতো হঠাৎ কেটে যেতেই বাঘ উঁচু থেকে দুম করে নিচে মাটিতে পড়ে গেল, আর ছটপটিয়ে মরে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে গোরু তালগাছ থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

তবে যাবার আগে মৃত বাঘের মুখে একটা ল্যাং মেরে দিয়ে গেল।।

"একটু হাসো"

ইজ ইট এ জোক্?

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

ইংরেজ আমলের কথা। বড় এক দোকানের এক মাঝারি মাপের সাহেব কর্মচারী তারই এক বাঙালী সহকর্মীর নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের এক কচুরীপানা-টোকাপানা ভরা ডোবা-পুকুর, জল-জঙ্গলে ভরা এক গ্রামে ছিল সেই কর্মচারীর বাড়ী। অন্নপ্রাশন মিটে যাবার পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্য করার জন্য সেই ভদ্রলোক তার পুকুর-পাড় দেখিয়ে দিলেন। পুকুরটি ছিল কচুরিপানা আর জোঁকে ভরা। সাহেব যথারীতি সবরকম কাজকর্ম সেরে ফিরে এলেন। এসেই প্রথমে উস্‌খুস্, পরে ছটফট্ করতে লাগলেন। এরপরের কথোপকথন ছিল এরকম—

= *Oh! I am feeling irretation! What is this?*

— সাহেব, বুস্‌সি। জোঁক লাগসে।

= *What? Joke!*

— হ্যাঁ সাহেব, জোঁক।

= *You idiot! It is already three inches inside, and you are telling it is a joke!*

মহিষ কখন সিংহ খায়

পুজোর ছুটি শেষ। স্কুল খুলেছে। আমাদের রসিক মাস্টারমশায় খগেনবাবু ক্লাসে ঢোকার সময় আমরা সবাই হইচই করছি দেখে বললেন—

'কিরে, এতো হইচই করছিস কেন?'

— 'স্যার, এবার আমাদের গ্রামের পুজোর সিংহটা মহিষের চেয়ে সাইজে বড় ছিল। সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সিংহ কি মহিষের চেয়ে বড় হয়? নগেন বলছে, সিংহ সাইজে ছোট হয় মহিষের চেয়ে। তাহলে সিংহ মহিষকে খায় কি করে? —গণেশ বলল।

'তাহলে তোদের সমস্যা হল সিংহের মহিষ ভক্ষণ। দুর্গা ঠাকুরের পায়ের তলায় তো দেখলি সিংহ মহিষ খাচ্ছে। বলদিকি মহিষ কখন সিংহ খায়?'— মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

সবাই অনেকক্ষণ ধরে মাথা চুলকেও উত্তর বের করতে পারলাম না। মাস্টারমশাইকে সঠিক উত্তরটা বলে দেওয়ার জন্য জেদাজেদি করতে লাগলাম।

মাস্টারমশাই বললেন— 'ক্লাসরুমের জানালার বাইরে শেয়ালমারীদীঘির চড়ার দিকে তাকা, উত্তর পেয়ে যাবি।'

আমরা হুড়মুড়িয়ে জানালার ধারে জড়ো হলাম। দেখলাম, বিসর্জন দেওয়া দুর্গামূর্তি থেকে বেরিয়ে আসা মোটাসোটা খড়ের পুটুলি দিয়ে তৈরি করা সিংহের 'বডি' টেনে টেনে খাচ্ছে একটা মহিষ।

তেল

শিবব্রত পট্টনায়েক

তেল কয় প্রকার? সর্ষের তেল, নারকেল তেল, রেড়ির তেল, রেপসীড তেল, পাম তেল, সূর্যমুখী তেল, কুড়োর তেল—মায় শিয়ালকাঁটার তেল—এসব ছাড়াও কেরোসিন তেল-টেলও আছে। তেল কী কাজে লাগে—তারও একটা সহজ হিসেব আছে। আজকের তেল অবশ্য এগুলোর কোনটাই নয়, আবার প্রয়োগের ধরণ অনুযায়ী যেকোন একটি অথবা সবগুলোকে একসঙ্গে বোঝাতেও পারে। এ তেল হল তৈলমর্দনের তেল। না—বাবুমশায়ের শরীরে চাকর-মোসায়েব দ্বারা মর্দ্দন করার সময়কার ব্যবহৃত তেল, অথবা কৃপালাভের ক্রয়-বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে সেইমতো যোগানো 'তেল'ও নয়; এ হল কাজ উদ্ধার করার জন্য বাবু-সাহেবদের অন্তরে লাগানো মুখনিসৃত 'বাণী'র 'তেল'। 'শত-কথায় সতী জব্দ, আর মিষ্টি কথায় বাকী সবাই'— না, বিষয়টা আজকাল অ্যাতো সহজ নেই আর, তেল লাগানোর কাজে পাত্রভেদ, মাত্রাভেদ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক নিয়ম-কানুন হিসেব-নিকেশ আছে। ঠিক জায়গায় ঠিকমতো লাগাতে পারলে এই তেলের কার্যকারিতা যেমন অসীম অবধি প্রসারিত হতে পারে, তেমনি বেঠিকজায়গায় বা বেঠিকভাবে লাগানো হলে এই তেলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প আছে।

এক সরকারি অফিসের কনট্রাক্টরদের নানান ধরণের বিল পাস হয়। এক্ষেত্রে যা হয়— অফিসের সব কর্মচারীর সাপ্তাহিক 'উপরি' রোজগার মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি। তো এইরকম এক অফিসে এক কমবয়সী কড়া ধাতের অফিসার এসে সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সব কর্মচারীর সংসারে হঠাৎ করে দাম্পত্যকলহও আমদানি হয়ে গেছে। নানান ধরণের উপঢৌকন, রাজনৈতিক চাপ, ভয় দেখানো ইত্যাদি কর্মচারী সিধে করার বহু পরীক্ষিত অস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে গেছে— ফল কিছু হয়নি। সবার মাথায় হাত! বকেয়া পড়ে থাকা প্রতিটি বিলের ব্যাপারে অফিসার ভদ্রলোক গোড়া থেকে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছেন, নিজে সবকিছু দেখতে চাইছেন। সবাইকে ভাগ দিয়ে সর্বনিম্ন দরপত্রে কাজ করতে গিয়ে কিছু করার থাকে না বলে কনট্রাক্টররা আর কিছুই করেন না, কর্মচারীদের উপযুক্তি দক্ষিণা দেওয়ার পর তাদের সহায়তায় শুধু বিলটা তৈরি করেন। এহেন অবস্থায় বিলের টাকা না পেলে তাদেরও বা চলবে কী করে? এদিকে অফিসের বড়বাবু পর্য্যন্ত 'স্যার স্যার' করতে গিয়ে তেল লাগানোর অপবাদসহ অফিসারের ধমক খেয়েছেন। কাজেই সবার একটাই চিন্তা—কী করা যায়? অফিসারতো কারোর কোনও কথা শুনতেই চাচ্ছেন না, কাউকে কাছে ঘেঁসতেও দেন না, তাই ওনার সঙ্গে কোনও কথাই কেউ বলতে পারছে না। এরপর সবাই মিলে এক বহুদর্শী বয়স্ক ভদ্রলোককে ধরলেন, যিনি সারাজীবন ধরে শুধুমাত্র ধুরন্ধর বুদ্ধি খরচ করে সফল ভাবে কনট্রাক্টরী ব্যবসা চালিয়েছেন, আর এখন ছেলের উপর ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক সমস্যাটি শুনে মুচকি হেসে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, পরের দিন দুপুরে কার্ড পাঠিয়ে পারমিশান নিয়ে সাহেবের অফিস ঘরে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে অফিসার-মহোদয়ের কথোপকথন ছিল এরকম—

—- আসতে পারি, স্যার?

— কী ব্যাপার?

— তাহলে সার পরে আসবো। আপনি ব্যস্ত আছেন ...

— না। আসুন। বসুন। বলুন কী বক্তব্য আপনার? প্রথমেই জেনে রাখুন, আপনার ফেবারে কোনও আইনবিরোধী কাজ করার জন্য অনুরোধ করবেন না।

— ওসব নয় সার। আমি শুধুই দেখতে এলুম।

— দেখতে? কী দেখতে?

— সার, আপনাকে দেখতে।

— আমাকে দেখতে? কেন? আমি কী অদ্ভুত দর্শন কোনও জীব নাকি?

— ছি ছি সার। কী যে বলেন! ওসব কিছু নয়। আসলে আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শোনার পর আমার আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে হল। দেখুন সার, আমার অনেক বয়স হয়েছে, জীবনে অনেক দেখেছি, তবে সার আপনাকে আজ দেখে আমার এই বয়সে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

— কী অভিজ্ঞতা?

— সার, কোনও মানুষ যে এতোটা সৎ হতে পারেন, কারো কাছে কোন ঘুষ-টুসতো দূরের কথা, কোনরকম চাটুবাক্য,

মানে আমরা যাকে বলি তেল দেওয়া— তাও পছন্দ করেন না, এরকমটা যে আদৌ ঘটতে পারে, তাই কোনদিন শুনিনি। আপনার মতো কোনও মানুষ যে হতে পারেন, এটা জানাই একটা অভিজ্ঞতা।

— তা বেশ। এজন্য আমি কী করতে পারি?

— না, না সার। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ক'রবতো আমি। আমি এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলব। আজকের দিনে আপনার মতো মানুষ— এ এক দৃষ্টান্ত! না না সার, আপনার অস্বস্তি হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে সার আমার একটা অনুরোধ আছে।

— অনুরোধ! কিসের অনুরোধ?

— না না সার! তেমন কোন ব্যাপার নয়। আমি তো এখন কর্মহীন বেকার মানুষ, আপনার মতো মানুষের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলতে পাওয়াও আমার কাছে অনেক। তাই মাঝে-মধ্যে আপনাকে একটু দেখতে আসতে চাই। অনুমতি দেবেন তো সার?

— (একটু অন্যমনস্কভাবে) আচ্ছা ... আসবেন।

এরপর বাকী কথা—আপনাদের সবার জানা। সুঁচ আর ফালের কী একটা উপমা আছে না? ▢

একটি নী-রস ঘটনা

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

জানলাম, বীরুবাবু বাণপ্রস্থে গেছেন। বাণপ্রস্থে, মানে বৃদ্ধাশ্রমে গেছেন। এমনিতে হয়তো বিষয়টিতে নূতন কিছুই নেই, কিন্তু এ'ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। বীরুবাবু আমাদের কলেজে পড়াতেন। উনি সু-শিক্ষিত, স-সম্মানে সারাজীবন প্রফেসারী করে গেছেন। ওনার সন্তান-ভাগ্যও খুবই ভালো। একমাত্র ছেলে পদার্থবিদ্যায় Ph.D. করে এখন প্রেসিডেন্সীর শিক্ষক। স্যার ঠিক নীতিবাগীশ না হলেও দুর্নীতির সঙ্গে কোনোদিন আপোশ করেছেন বলে শুনিনি। ওনার স্ত্রী বহুদিন আগেই গত হয়েছেন। ছেলে-বৌমা দুজনেই খুব ভালো, বৌমাও চাকুরী করেন সল্টলেকে, সেক্টর V-এ। খুবই যত্ন নেন শ্বশুর মশাইয়ের। এইরকম একজন মানুষ বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন, ভাবা মুশকিল। দারুণ কৌতুহল নিয়ে আমি আর অমিত গত রবিবার গিয়েছিলাম স্যার-এর সঙ্গে দেখা করতে, বৃদ্ধাশ্রমে।

কিছুক্ষণ নানান বিষয়ে আলোচনার পর অমিত স্যারকে জিজ্ঞাসা করল ওনার এই বৃদ্ধাশ্রমে আসার কারণ। প্রথমে স্যার কিছুতেই এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলেন না। অনেক সাধাসাধির পর উনি মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগ কিছুটা খালি করলেন আমাদের সামনে।

—দ্যাখো অমিত, তোমরা তো আমাকে জানো। আচ্ছা, কখনও কি তোমাদের মনে হয়েছে যে তোমাদের স্যার একটি উজবুক বা আধপাগল?

—না স্যার। আমাদের চিরদিন উল্টোটাই মনে হত। বোধ হয় আপনার সব প্রাক্তন ছাত্রই এ কথা বলবে। আপনি প্রতিদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর নোট ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন যে পরের ব্যাচকে পড়ানোর সময় আপনি নতুন করে নোট বানাবেন। পুরানো নোট থাকলে আপনি নাকি অলস হয়ে যাবেন। আপনার কাছ থেকেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা সম্পর্কে জানতাম। বোধহয় আমাদের সমস্ত ছাত্রের চেয়েও আপনি বেশী সময় কাটাতেন লাইব্রেরীতে। তাহলে আপনার এরকম মনে হচ্ছে কেন?

—আর কেন! তোমরা তো জানো আমার ছেলে বা বউমা আমাকে খুবই যত্ন করে। ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত জানাতে ওরা দুজনেই কান্নাকাটি করছিল। কিছুকেই আসতে দিচ্ছিল না।

—তাহলে এলেন কেন?

—কি করে তোমাদের বোঝাই বলতো!

—বলুন না স্যার।

—আমি চলে এসেছি কারণ নিজেকে প্রতিদিন একটি ব্যাকডেটেড, গাড়োল বলে মনে হচ্ছিল বলে। নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতাকে মেলাতে পারছিলাম না বলে।

—কেন স্যার?

—তোমরা তো জানো, আমার দুই নাতি-নাতনি দুজনেই পিঠোপিঠি এখন দুজনেই বড়ো হয়েছে। ওর বাবা-মা হোম ইউনিভারসিটিতে ওদের ভর্তি করিয়েছে।

—তাতে কি হোল?

—না তাতে কিছু হয়নি, জানিনা তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা। আগে ছিল সজারু-ছাঁট চুল। ক'মাস আগে নাতি আমার মাথার দু'দিক ন্যাড়া করে এল, এক কানে লাগিয়ে এল লোহার দুল। এদিকে গোটা হাতে-ঘাড়ে-পিঠে কিসব চিত্র-বিচিত্র আঁকা। কলেজে যায় হাফ-প্যান্ট পরে। তো একদিন বললুম—হ্যাঁরে, তুই এরকম স্টেগোসরাসের পিঠের মতো চুল রেখেছিস কেন?

নাতি তো প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলো না। ওর বাবা স্টেগোসরাস কি তা জানে। ছেলেবেলা

অরণ্যদেব কমিকস্‌ও পড়েছে। তাই বলে দিল এ'টি একটি একটি ডাইনোসর।

নাতি আমার রেগে কাঁই!

এ'দিকে নাতনি তো অনেকদিন ধরেই আমার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। দ্যাখো, আমার বৌমাও জিনস্ পরে অফিস যায়। এটা ব্যবহার করা সহজ, পরে বাইরে বেরনো সহজ। তবে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়, কারণ এতে ময়লা বোঝা যায় না। নাতনি পরতো ছেঁড়া আর ফাটা জিনস্। তারপর শুরু করল লেগ-ইন পরা। চুলে বিচিত্র সব রং-করা। ঘরে-বাইরে সব-সময় হাতে মোবাইল আর কানে প্লাগ লাগানো। নাতনির এইসব পোশাক পরে বাইরে যাওয়া আর বাড়ীতে সবসময় হাফপ্যান্ট পরে থাকাটা আমার ঠিক সহ্য হয় না। সেদিন দেখলাম নাতনি পরেছে একটা নতুন ধরনের জামা। তো বললুম—এটা কি নতুন ডিজাইন নাকি? মনে হয় কোন ডাক্তার ডিজাইন করেছে। ইন্‌জেকসন দেওয়ার জায়গাটা ফাঁকা রেখেছে।

নাতনি রেগে আগুন।

বুঝলে, বছর দেড়েক আগের একটা ঘটনা শোনো। একদিন নাতিকে দেখলাম একটু বেশী সাজগোজ করতে। জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, কোথাও কোন স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে নাকি? নাতির উত্তর—না দাদু, আজ আমাদের আন্দোলন। আমরা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দোবো আন্দোলন কাকে বলে! সমস্ত অচলায়তন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

শুনে ভালো লাগলো। যাক, নাতি আমার অন্ততঃ নিজেকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে শিখেছে। সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, ক্ষমতাশালীদের, দুর্নীতিবাজদের অত্যাচার—এসব তাহলে ওকে ভাবাচ্ছে। তাই একটু বিষদে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, তোদের আন্দোলন কি নিয়ে? আজ কি করবি?

—আমাদের আজ 'কিসি' আন্দোলন।

—মানে?

—আমরা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একে অন্যকে ধরে কিস্ করবো। ভেঙ্গে ফেলবো তোমাদের বুড়োদের এই অচলায়তন।

—ঠিক বুঝলাম না। একটু খুলে বল।

আমার নাতি খুলে বলল। চেনা-আধচেনা-অচেনা ছেলে-মেয়েরা নাকি আলিঙ্গন করবে আর জিবে জিব ঠেকাবে। এটাই আন্দোলন। শুনেই আমার গা-গুলোতে লাগল। বললাম—তোর বোনও যাবে নাকি?

নাতির উত্তর—নিশ্চয়ই।

অমিত আর আমি খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবতে থাকলাম স্যারের অবস্থাটা। তারপর অমিত জিজ্ঞাসা করল।

—স্যার, এজন্যই কি চলে এলেন এখানে?

—না। শুধু এজন্য নয়। আরো অনেক দৈনন্দিন ঘটনা আছে। যেমন ধরো আমার ডায়াবিটিস রয়েছে। মাঝরাতে বাথরুম যেতে হয়। আমার নাতনির সামনে পরীক্ষা। রাত আড়াইটা নাগাদ বাথরুম থেকে ফিরতে গিয়ে দেখি ওর ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম রাত জেগে পড়ছে। গিয়ে দেখি বিছানায় এলিয়ে বসে মোবাইলে কিসব করছে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি করছিস রে?

—দাদু, Facebook করছি।

এরপর যখন বললাম—পরীক্ষার আগে অকারণ রাত জেগে কি লাভ, তো নাতনি আমায় বুঝিয়ে দিল—শুধু পড়ার বই পড়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না, এইসব Mobile কাজকর্ম না জানলে নাকি জীবনে কিছুই জানা হয় না।

—স্যার, তারপর কি হোল?

—কিছুই হয়নি। আমি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

—স্যার, এটাই কি আপনাকে চালিত করল বাড়ী থেকে এখানে চলে আসতে?

—না, ঠিক তা নয়, আরো অনেক ছোটখাট ঘটনাও আছে। যেমন ধর আমার নাতির গান শোনা। তোমরা তো জানো আমি রাগ সঙ্গীতের ভক্ত। আর আমি কানে হুক লাগিয়ে গান শুনতে পারি না। যখন গান শুনি, সঙ্গে সঙ্গে নাতি-নাতনি

গলা ভেঙ্গায়। ভাবলাম, ওদের ভালোলাগার গান আমি শুনলে হয়তো ওরা এরকম করবে না। তো একদিন নাতির ঘরে ওদের গান শুনতে গেলাম। গান শুনে মনে হল গায়ক বোধহয় আমাকে মারতে আসবে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—এ হল 'র‍্যাপ'।

বুঝলে, সত্যিই বোধহয় আমি এযুগের কিছু বুঝিনা। Totally backdated। আমি এ বয়েসে আর ওদের সমস্যার কারণ হতে চাই না, তাই চলে এলাম।

আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্যারকে বোঝার চেষ্টা করলাম। এরপর প্রণাম করে বেরিয়ে আসার সময় স্যার আমাদের মাথায় হাত ছোঁয়ালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। ফিরে আসতে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিলাম আমাদের প্রিয় শিক্ষককে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক মানুষ হয়ে বসে আছেন।

ডাঃ বিরূপাক্ষ মুখার্জী
M.Sc. (1st Class 2nd), Ph.D. (Ednb.)

সংকেত

ডাঃ শিব্রবত পট্টনায়েক

দিনের পর দিন সারাক্ষণ তিতিবিরক্ত থেকে এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না সমীরণ। নানান কাজের ঝামেলায় দিনের বেলাটা যাহোক করে কেটে যায়, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আসার পর থেকে ভাবনাগুলো মাথা জুড়ে জাঁকিয়ে বসে, তাড়াতে গেলেও বার বার ফিরে ফিরে আসে, আর অসহ্য যন্ত্রণার ঝড় যেন সারা মন জুড়ে বয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে ভাগ্য ব্যাপারটাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ কোন দিন খুঁজে পায়নি, অথচ এখন মনে হয় জীবনের এই দুর্গতি বোধহয় ভাগ্যই নিয়ন্ত্রণ করছে, তা না হলে ছেলেবেলা থেকে হাজারো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আজকে একটা নিশ্চিত আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোরাটোপের মধ্যে পৌঁছেও জীবন এরকম অর্থহীন হয়ে গেল কেন? জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে নাড়াচাড়া করে কোন বড়সড় ভুল বা অন্যায় কাজের কথা মনে পড়ল না তার। বিয়ের আগে মেয়েদের সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে থেকে ছেলেবেলা থেকে লড়াইয়ের ময়দানের একবগ্গা ঘোড়ার মতো যুদ্ধ চালাতে গিয়ে মোয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফুরসত হয় নি, প্রেম-ফেম করাতো অনেক পরের ব্যাপার। সেজন্যই কি জানা বোঝার শিক্ষাগুলো সবই ভুল আর তাই এই দুর্ভোগ? নাকি রমা দিনরাত যা বলতে চাইতো সেটাই হয়তো বা ঠিক-গায়ের রং আর আকৃতি দেখে মেয়েরা ঘেন্নায় কাছে আসেনি। কিন্তু কলেজের সহপাঠী বা জুনিয়র মেয়েদের অথবা সামাজিক নানান অনুষ্ঠানে মেয়েদের সঙ্গে যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, তাতে তো এরকম কিছু কখনও মনে হয়নি। নিজেকে আয়নায় সবাই সুন্দর দেখে, কিন্তু তাহলেও কেউ তো কোনদিন বলেনি যে সমীরণ দেখতে খুব খারাপ। নাকি সায়ন্তনরা যা বলে সেটাই ঠিক—মেয়েদের বিয়ের আগে কোন ছেলের সাথে প্রেম আর শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেলে পরে অন্য কোন ছেলের সাথে চাপ দিয়ে বিয়ে দিলে বিয়ের পর স্বামীকে কোনদিন তার আর্কষণীয় মনে হবে না, উঠতে বসতে শুধু দোষগুলোই চোখে পড়বে। তাই যদি হয়, তাহলেও এর পেছনে নিজের দোষটা কোথায় সমীরণ তা হাজার চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছিল না। পরিচিত এক ঘটকের খোঁজ দেওয়া সামাজিক বিয়েতে মত দেওয়ার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? বন্ধুরা বলে বিয়ের আগে ঠিকমতো খোঁজখবর নিলে কিছু কিছু খবর নিশ্চয়ই জানা যেতো, আর তাহলে বিয়ে হত না, সমস্যাও হত না, অনেক চিন্তা করেও সমীরণ বাবা-মায়ের বিশেষ কোন খোঁজ খবর না নিয়ে এককথায় বিয়েতে রাজি হয়ে যাওয়ার মধ্যেও কোন দোষ খুঁজে পেল না। হয়তো নিজের ছেলের সাধারণ চেহারা আর চাপা গায়ের রঙের কথা ভেবে সুন্দরী রমাকে ছেলের বৌ করার জন্য একটু বেশি উদ্যোগী হয়ে পড়েছিলেন ওনারা। সেটা কি খুব দোষের কিছু? এমনতো নয় যে রমা বিয়ের আগে হবু বরকে দেখেনি বা কোন কিছু গোপন করে বিয়ের কথাবার্তা চালানো হয়েছে। বিয়ের পরে অবশ্য এই কথাগুলোই সবসময় বলতো রমা। নিজের প্রয়োজন হলেই এভাবে ডাহা মিথ্যে কথা অম্লানবদনে বলে চলতে মানুষ যে পারে, সমীরণের সেই অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। নাকি বন্ধুদের কথাটাই ঠিক—সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের বেতনের অঙ্কটাই তখন রমার ইস্কুল মাস্টার বাবা-মা আর রমাকে লোভে ফেলে

দিয়ে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর পর রমার অতীত জীবনের নানান খবর বয়ে আনা বেনামী চিঠিগুলো হাজারো সন্দেহের জন্ম দিলেও অনেক চেষ্টায় সেগুলোকে চেপে রেখে অতীতকে অতীত হিসাবে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেও তো কোন লাভ হল না। এতো কিছুর পরও রমার ওপর বিশ্বাস রাখাটাই বোধহয় কাল হল। ডিউটিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর পর প্রায় প্রতিদিন রমা বেরিয়ে যেত—দারোয়ান বহুবার ইঙ্গিতে একথা জানাবার পরও রমার মার্কেটিংয়ে যাওয়ার কথায় বিশ্বাস করাটা বোধহয় ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনদিন বাবার বাড়ী যাওয়ার নাম করে যে অ্যাবর্সান করাতে যাবে, আর সেকথা মাসিকে দিয়ে ফোন করিয়ে জানাবে, এটা ভাবতে গিয়ে এখনও কষ্ট হয় সমীরণের। দু'বছর ধরে হাজারো বোঝানোতে কাজ না হওয়ায় একরকম জোর করে বাচ্চা নিয়ে আসার চেষ্টাতেও কোন কাজ হল না। বন্ধুদের কারো কারো মতে রমার অবিবাহিতা মাস্টারণী মাসিটাই আসল শয়তান, কারোর মতে ওর মায়ের ইতিহাসও খুব নোংরা, আর একজনতো বলেই দিল এ হল রক্তের দোষ। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, এ যুগের একজন শিক্ষিতা মেয়ের কাজকর্মের মধ্যে কোন যুক্তি থাকবে না, এটা কি করে সম্ভব? নাকি অভয়কাকুর কথাই ঠিক, এযুগে ডিগ্রী আর শিক্ষা সম্পূর্ণ দুটো আলাদা বিষয় হয়ে গিয়েছে।

বধু অত্যাচারের কয়েকটা ধারার কেসের কারণে গ্রেফতারী এবং সাধারণ সরকারি চাকুরে বাবার আর নিজের সাসপেনশনের হাত থেকে বাবার বাল্যবন্ধু অভয়কাকুই আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়ে বাঁচালেন, নাহলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা ভাবতে গেলে এখনও সমীরণের আতঙ্ক হয়। রিটায়ার করার তিনমাস আগে সাসপেন্ড হয়ে গেলে বাবাতো পেনসনও পেতেন না। সমীরণ ভাবলো—এ দেশের এ কেমন নিরপেক্ষ আইন, যেখানে রমা তার সেই প্রেমিকের সঙ্গে প্রায় লিভ-টুগেদার করে আছে, অথচ ডিভোর্সও দেবে না, আর সমস্ত আইন তারই পক্ষে। আইনের মতে নাকি কোন শক্তপোক্ত প্রমাণ ছাড়া রমার এই জীবনযাপন নিয়ে কিছু বলার বা বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই তার। সেরকম কিছু করতে গেলে আরো মারাত্মক ধরনের মিথ্যে কেসে ফেঁসে যেতে হবে, যেখান থেকে বেরোন খুব কঠিন। অভয়কাকু এতো বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হয়েও বলে দিলেন যে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী মহিলারা নাকি সর্বদাই নির্যাতিতা, কখনওই নির্যাতনকারী হতে পারেন না, অন্ততঃ আইন তাই মনে করে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যেই থাকে, এ'কথার উপর নির্ভর করে কি করে কোন সভ্য দেশের আইন তৈরি হয়, হাজারো চিন্তা করেও সমীরণ তা বুঝতে পারল না।

নিজের দিনযাপনের এই গ্লানি আর হতাশার মধ্যে আদর্শবাদী বাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে রাগে মাথা ফেটে যেতে চায়, যখন মনে হয় ছেলেবেলা থেকে চরিত্রগঠন, সংযত আচরণ, মেয়েদের থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা, সম্মান করা—এসব শুনে শুনে এমন মানসিকতা হয়ে গিয়েছে যে হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে রমার স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকে এক অদৃশ্য দেওয়াল। কনট্রাসেপটিভগুলোর আবিষ্কার অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করেছে নাকি স্বেচ্ছাচারী, কদাচারী হওয়ার পথে মেয়েদের উৎসাহিত করেছে, নিজে ডাক্তার হয়েও সমীরণ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না।

★ *একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। নামগুলোই শুধু কাল্পনিক।*

পাড়ি

শিবব্রত পট্টনায়েক

অনেক ক্ষণ ধরে বিছানায় পাশ ফিরে ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করে একসময় আকাশ বুঝল—আজ রাতে আর চোখে ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা নেই। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে হোম সার্ভিসের না খোলা ফুড ক্যারিয়ারের প্যাকেটটা টেবিল থেকে সরিয়ে রেখে জলের বোতল থেকে বেশ খানিকটা জল খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আকাশ চেষ্টা করতে লাগল নিজের চিন্তা-ভাবনা গুলোকে খানিকটা অন্তত গুছিয়ে নিতে। ছেলেবেলা থেকেই নানান প্রতিকূলতার মধ্যে বড় হওয়া, দুর্ঘটনায় বাবা মারা যাওয়ার পর টিউশন পড়িয়ে মেসের খরচ যোগাড় করে চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়াশোনা করা, মায়ের মৃত্যু, আর তারপরের বেশ কয়েক বছরের বেকারত্ব আর বেকারত্ব কাটানোর তীব্র লড়াই করার দিনগুলোতেও কোনদিন নিজেকে এরকম হেরে যাওয়া আর ঠকে যাওয়া বলে মনে হয়নি। কষ্ট-যন্ত্রনার দিনগুলোকে পেছনে ফেলে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের ঘেরাটোপের মধ্যে জীবনের এই স্তরে পৌছে যাওয়ার পর এরকম কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কথা কল্পনাতেও কোনোদিন আসেনি। অথচ আজকের দিনটা শুরু হয়েছিল আর দশটা দিনের মতোই। সীমা অ্যাডভান্স অবস্থার শেষ দুটো মাস বাবার বাড়িতে কাটানোর জন্য চলে যাওয়ার পর থেকে দিন পনের যেমন চলছিল, আজকের দিনটাও তার থেকে আলাদা ছিল না। বিকাশের ফ্লাটে অফিস ফেরৎ আড্ডা সেরে বাসায় ফিরে আসা অবধি নিস্তরঙ্গ জীবনের ছন্দ স্বাভাবিক পথেই চলছিল। অভ্যাসমতো লেটার বক্স চেক করতে গিয়ে অজানা হাতের লেখা দেখে খামটা খোলার কৌতুহল মেটাতে গিয়ে সবই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

চিঠিটা লিখেছে কোন এক নীলাঞ্জন—নামটা আসল কিনা কে জানে; অথচ চিঠিতে সীমা সম্পর্কে বর্ণনা এতো সঠিক, এতো ডিটেল, যে কোন ভাবেই ফালতু ব্যপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া সঙ্গের কাগজটা যে সীমারই হাতের লেখায় অতীতের কোন প্রেমপত্রের জেরক্সকপি, তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ চিঠির বাকি কথা মনে এলেই আকাশের মাথার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ

হতে শুরু করে—নিস্ফল আক্রোশে সমস্ত কিছুকে ভেঙে-চুরে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয় তার। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আকাশের মনে হ'ল ফ্যানের তলায় বসেও তার মাথা-গা-সারা শরীর যেন গরমে পুড়ে যাচ্ছে। অস্থির হাতে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে শোয়ার ঘর ছেড়ে ছাদে উঠতে লাগলো সে। ছাদের আলসেতে ঠেস দিয়ে শহরতলির তারা ঝলমল অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে নিজের জীবনে যেন এক চরম শূন্যতার উপলব্ধি হ'ল তার। ধীরে ধীরে ছবির মতো মনে পড়তে লাগল গত বছর দেড়েকের দাম্পত্য জীবনের নানান খুটিনাটি। অনেক ভেবেও সীমার এত দিনকার কথাবার্তা, ব্যবহার বা কাজকর্মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। এতোদিন একবারও মনে হয়নি সীমা নিজের কোনও দায়িত্বে ফাঁকি দিয়েছে; নিজেদের সম্পর্কের বোঝাপড়ার মধ্যে কোন ফাঁক আছে বলেও মনে হয়নি। আকাশের মনে পড়ল—বিয়ের পরপরই সীমা কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন ধারণা হয়েছিল সীমা হয়তো তার কিশোরী প্রেমের ইতিহাস শোনাবে। সারা ছাত্র জীবনের প্রতিটি দিনই শুধু নিজের দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই লড়তে ব্যস্ত থাকতে হ'ত, তাই হয়তো মেয়েদের প্রতি মনযোগ দেওয়ার সময়, সুযোগ বা মানসিকতা তার ছিল না। কিংবা, আকাশ ভাবল, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তৈরী হওয়া মনের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকা অজানা কোন হীনমন্যতা বোধই তাকে সহপাঠিনীদের সাথে, অথবা জুনিয়র মেয়েদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী করার পথে মানসিক ভাবে বাধা দিত। অথচ মেয়েদের প্রতি বয়সের কারণে যে বিস্ময়বোধ বা কৌতুহল থাকে, তা তো তার ছিল পুরোমাত্রায়। পরিণত মনে সেগুলোকে ফালতু বলে মনে হলেও কলেজ জীবনে বন্ধুদের প্রেমের গল্পের দৈনিক বর্ণনাগুলো অন্য সবাইয়ের মতো তারও উপভোগ্য মনে হ'ত। সীমার না বলা কথাগুলোকে তাই কলেজী প্রেমের কোন ব্যাপার বলে ধারণা হয়েছিল তার, সেজন্য এরকম কোন প্রেমের কোন পূর্বরাগ-অনুরাগের ইতিহাস জানার কোন ইচ্ছে তখন হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা যে কলেজ পালিয়ে লজে রাত কাটানো পর্যন্ত যাওয়া কোন বিষয় হতে পারে, তা তখন কল্পনাতেও আসেনি। অথচ চিঠিতে লেখা দীঘার লজের নাম-ঠিকানা-তারিখ-রুমনাম্বার থেকে শুরু করে সীমার শরীরের গোপন অঙ্গের খুব কাছে থাকা ছোট্ট জড়ুলটার বর্ণনা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা মনে আসায় ঘেন্নায় আকশের শরীর শিউরে উঠল, আর সারা দেহ-মন সীমার প্রতি রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইল, অসহ্য বিরক্তির মাঝে খোলা ছাদের উপর চিত হয়ে তারা ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে স্নায়ুগুলো উত্তেজনা হারিয়ে একসময় কিছুটা ঝিমুনির ঘোর এনে ফেলল আকাশের চোখে। আস্তে আস্তে তাই নিজের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল সে। চিন্তাগুলোর মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর ছাদ থেকে নেমে বিছানায় ফিরে গেল আকাশ। বিছানায় মশারীর মধ্যে বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়তে লাগল একই ঘরে একই বিছানায় কাটানো ফুলশয্যার রাত্রির স্মৃতিগুলো। সীমার সঙ্গে গল্প করে করেই প্রায় কাটিয়ে দেওয়া সে রাত বা তারপরের আরো অনেক রাতের কথাও মনে আসছিল তার। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার নামে কল্পনার ফানুস ওড়ানো, অকারণ খুনসুটি করা, আদর, কপট রাগ—দাম্পত্যের মধুর স্মৃতিগুলোর কথা মনের পর্দায় ভেসে চলার সময় সেগুলোর মধ্যে কোন ফাঁকি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। ইউরিন টেস্টের দ্বিতীয় ব্যান্ড যেদিন সন্তানের আগমনবার্তা ঘোষনা করেছিল, সীমার সেদিনকার আনন্দকে কোন ফাঁকি বলে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। অথচ আজকের চিঠির কথাগুলোকেও অস্বীকার করার কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল না সে। ঘটনা কী, তা বোঝার পরেও আকাশ তাই তো বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুন্দর, স্বপ্নময় এক দম্পতির মাঝে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কংক্রীটের প্রাচীর হয়ে হাজির হয়ে গেল এক সম্পূর্ণ অজানা মানুষ—এতো

যন্ত্রনার মাঝেও ঘটনাক্রমের ক্ষমতা, তীব্রতা আর আকস্মিকাতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। নীলাঞ্জন যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছে এই সময় এরকম একটা চিঠি লিখল, তা থেকে মনে হয় বিয়ের পরের এতদিনকার সব খবর নিশ্চয়ই সে রাখতো; না হলে সীমাকে চরম বিপাকে ফেলার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার জন্য ঠিক এই সময়টাকেই বেছে নিত না। প্রতিহিংসা কোন মানুষকে কীভাবে এতটা নীচে নামাতে পারে, তা ভাবতে পারছিল না আকাশ। সীমার সঙ্গে নীলাঞ্জনের সম্পর্ক যদি গভীরই ছিল, তবে তা পরিণতির দিকে এগোল না কেন? এর কারণ কি শুধুই কোন এক চাকুরীওয়ালা বর পাওয়ার লোভ? নীলাঞ্জন কী বেকার, নাকি ধনী বাড়ির বখাটে ছেলে? নাকি কলেজি প্রেম ব্যপারটাই এতো ঠুনকো? অথবা এমনতো হতে পারে যে এরকম নীচ মানুষের মানসিকতার সঠিক হদিস পেয়েই সীমা পিছিয়ে এসেছিল! অনেক ভেবে শেষের সম্ভাবনাটাকেই আকাশের বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল। এছাড়া শরীর-মনে আকাশকে কাছে টেনে নেওয়ার আর নিঃশর্ত অধিকার দেওয়ার মাঝে সীমার মধ্যে কোন অস্বাচ্ছন্দ না থাকার অন্য কোন বিশ্লেষণ হয়না যে! সীমা হয়তো ভুল করেছে, শুধরেও তো নিয়েছে, তাহলে তাকে অপরাধী ভাবা যাবে কীভাবে? পুরো ব্যপারটা একবার সীমার কাছ থেকে জানার ইচ্ছে হ'ল তার। কিন্তু আবার মনে হ'ল সীমা যখন পুরো ব্যপারটা ভুলতে পেরেছে, ভুলে নতুনভাবে সবকিছু গড়ে তুলতে চাইছে সুন্দর করে, পবিত্র করে সে সময় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা মানেই তো তার চেষ্টাটাকেই ধ্বংস করে দেওয়া। তাছাড়া ক্ষতস্থানে খুঁচিয়ে চললে ঘা তো কখনও শুকনো হবে না। এর চেয়ে সংসার-সন্তান নিয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করা অনেক সহজ আর কাম্য বলে মনে হ'ল তার। ঘায়ের দাগ যদিবা থেকেও যায়— ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে চললে শরীরের পুরানো ক্ষতচিহ্নের মতোই একদিন তা হয়তো প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে পৌছে যাবে। তাছাড়া, আকাশের মনে হ'ল, সারাজীবন ধরে হাজারো টুকরো টুকরো কষ্ট আর যন্ত্রনার স্মৃতি বুকে জমিয়ে রেখেই তো বেঁচে থাকতে হয় আধুনিক মানুষকে। ❐

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুর

শিবব্রত পট্টনায়েক

কাল সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হয়নি রমার। বারবার বাথরুমে গিয়ে হাতে-পায়ে আর ঘাড়ের পেছনে জল ঝাপটা দিয়ে কিছুই লাভ হয়নি। অথচ এই রাতের অপেক্ষায় গত তিনটে বছরের প্রতিটি দিন কেটে গেছে। তখন মনে হত কোর্টের রায়টা নিজের পক্ষে এলেই বুঝি নিশ্চিন্তে ঘুমুনো যাবে। কাল বিকেলে সোমনাথকাকুর ফোনটা পাওয়ার পর একটা তৃপ্তি আর প্রাপ্তির অনুভূতিতে মনটা ভরে ছিল, অবশ্য ভীষণ ক্লান্তও লাগছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। অথচ রাতে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেওয়ার পরই যেন দুচোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। সারা শরীর-মনে ক্লান্তি, অথচ নির্ঘুম রাত— এক দুঃসহ অবস্থা। বারবার সমীরণদের কথা মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে যেন বেশি করে মনে আসছিল পুরানো ঘটনার নানান খুটিনাটি টুকরো ছবি। ঘুমোনোর নিস্ফল চেষ্টায় রাত কেটে গেল, তাই দুচোখের কোণে জমে থাকা ক্লান্তি নিয়েই দিনটা শুরু হল রমার। যান্ত্রিকভাবে বাথরুম সেরে হারুর মায়ের হাত থেকে চা নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে রমার মনে হল— কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে এক শূন্যতা যেন চাপ-চাপ অন্ধকারের মতো ছড়িয়ে আছে। কিছুই ভালো লাগছিল না তার। সেজন্য মায়ের একমুখ হাসি নিয়ে সামনে বসাটাকেও লক্ষ্য করতে চাইছিল না মন।

— যাক বাবা, এতোদিনে মুক্তি। এবার তোর নূতন জীবন শুরু হবে, খুকু। সোমনাথদা কেমন সমীরণদের চেপে ধরেছিল দেখেছিস! ঠিক খোরপোষ আদায় করে ছাড়ল। টাকা দেওয়ার ভয়ে ওদের উকিলের কতো কাঁদুনি। টাকা দেবে না, ইয়ার্কি!

মায়ের কথাগুলো শুনতে একদম ভালো লাগছিল না রমার। আসলে কারো সঙ্গে কোনও কথা বলতেই যেন অরুচি হচ্ছিল। জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব করতেও মন চাইছিল না। যতোদিন ডিভোর্স আর খোরপোষের কেস চলছিল, ততোদিন সমীরণের সঙ্গে লড়াই

করার মধ্যেই যেন একটা মেতে থাকার মতো ব্যাপার ছিল, আর এখন চাওয়া মাফিক সবকিছু পেয়েও ভালো লাগছিল না তার।

— দিদিমনি, সুলতা দিদিমনির ফোন।

সুলতার সঙ্গে ফোনে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল না রমার। এতো উচ্ছ্বাসের উত্তরে হুঁ হাঁ করে কথার জবাব দেওয়ায় আবার সুলতা কি মনে করল কে জানে! সারাদিনই এরকম বান্ধবী-শুভানুধ্যায়ীদের কনগ্রাট্‌স ফোন আসতেই থাকবে— একথা ভেবে রমার বিরক্তি লাগছিল।

— মা, আমি একটু একা থাকব। কারো ফোন এলে বলে দিও আমি বাড়ি নেই।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কিছুটা তৃপ্তি পেল রমা। চিত হয়ে বালিশে মাথা রেখে বাঁ হাতের চেটোতে চোখ ঢাকা দিতেই মনের মধ্যে আবার ভিড় করে এলো পুরানো সব কথা। সমীরণের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে ভাবতে একদমই ভালো লাগছে না, অথচ এর জন্যেই তো এতোদিনের লড়াই। মা শুধু খোরপোষের টাকার কথা ভাবছে, অথচ খোরপোষের টাকা না পেলে খাওয়া জুটবে না, এমন আর্থিক অবস্থাতো তাদের নয়। মায়ের চাকুরি এখনো সাত বছর আছে; বাবা মারা যাওয়ার পরে পাওয়া টাকাগুলোও তো সবই জমানো আছে— সেও খুব কম নয়। অথচ কেস জেতার জন্য সোমনাথকাকুর কথায় কোর্টে সমীরণদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগছিল। একবার বলে দিয়ে আর পিছিয়ে আসা যায় না, সেজন্য জেরার সময়ও একই কথা বারবার বলতে হচ্ছিল। দু'জন মানুষের মানসিক দূরত্ব নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ নয়— সেজন্য একজনকে চরিত্রহীন অথবা অন্যজনকে অত্যাচারী না প্রমাণ করতে পারলে কেস জেতা যায় না। তখনও এই মিথ্যাচারকে মেনে নিতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। মা আর সোমনাথকাকুর বোঝানোতে তখন এসব বলতে রাজী হয়ে বোধহয় ভুল হয়ে গেছে। তাছাড়া শেষের দিকেতো সমীরণ বোঝাপড়া করার চেষ্টাও করেছিল। যা হল, তা ঠিক হল কি না, অথবা কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক—এসব ভাবতে গিয়ে কোনও রাস্তা না পেয়ে রমা যেন নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল।

— একা একা শুয়ে আছিস কেন? সবাই তোকে খুঁজছে। যা, কথা বল।

— মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার একদম ভালো লাগছে না।

— তুই তো অবাক করলি! আজ আনন্দের দিনে তোকে সবাই খুঁজছে, আর তুই শুয়ে আছিস! কি হয়েছে তোর? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

— আঃ, শরীর খারাপ হয়নি। তুমি যাওতো।

— দেখ, শরীর খারাপ নয়, তবু তুই শুয়ে থাকবি? আমি সবাইকে বার বার এতো মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

— তুমি থামবে? মিথ্যে কথা না বলা নিয়ে আর বড়াই করো না তো। ক'দিন আগেইতো সবাই মিলে সাজানো মিথ্যে কথাগুলো কোর্টে বলার জন্য আমাকে বোঝাচ্ছিলে।

— তোর কি হয়েছে বলতো খুকু? আজকের দিনে এইসব কথা তুলছিস! কেসে জেতার জন্যে এরকম অনেক কিছু করতে হয়, সব সময় সত্যি কথায় কাজ হয়না। ওই কথাগুলো তুই না বললে আমরা জিততে পারতাম? আমরা তোকে তোর ভালোর জন্যেই

বোঝাচ্ছিলাম। কারো কথা শুনবি না, ঝামেলা পাকাবি, আবার তোর ভালোর জন্য কিছু করতে গেলে কথাও শোনাবি!

— তোমার কোন কথা শুনিনি মা? কি ঝামেলা পাকিয়েছি?

— দ্যাখ, এখন আর সেসব কথা বলতে চাই না। তুই-ই কথাগুলো তুললি। সমীরণকে বিয়ে করার জন্যে তুইতো পাগল হয়ে গিয়েছিলি! আমার মতের কোনো গুরুত্ব দিয়েছিলি? ওদের পুরানোপন্থী বাড়ি, ওই বাড়িতে বিয়ে হয়েই তো তোর সর্বনাশ হল।

— দ্যাখো মা, সমীরণকে বিয়ে করে আমার সর্বনাশ হয়নি। আমার যা হওয়ার তা হয়েছে তোমার জন্যে।

— আমার জন্যে! তার মানে?

— মানেটা এখন বুঝতে পারছো না, না? তুমিইতো বুদ্ধি দিয়েছলে বিয়ের পর পর বাচ্চা নিয়ে নিলে জীবনে মজা করবি কখন, সমীরণরা গেঁয়ো, ওদের জানানোর দরকার নেই, আমিই ব্যবস্থা করছি ... এইসব।

— সে তো তোর ভালোর জন্যেই।

— ভালোর জন্যে, তাই না? একবারও ভাবলে না এ ঘটনা গোপন না থাকলে কি হতে পারে?

— তুই বললি কেন?

— মা এতোদিন বলিনি, আজ বলছি, শোন। সমীরণ মনে হয় ডাক্তারদের কথায় কিছু আঁচ করেছিল। সেজন্যই বোধহয় একদিন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি মিথ্যে বলতে পারিনি।

— বেশ করেছিস। যা চুকে বুকে গেছে, তা নিয়ে এতো ভাবার কি আছে?

— মা, সমীরণের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অভাব হতে শুরু হয়েছিল কিন্তু এরপর থেকেই। ওর যখন তখন রেগে যাওয়া, ঝগড়া করা — এসব কিন্তু আগে ছিল না।

— তুই কি বলতে চাস? আমিই এজন্য দায়ী?

— আমি কিছু বলছি না, মা। শুধু তুমি আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার একদম ভালো লাগছে না।

— খুকু খুকু, মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে? তোর এমন কি বয়স? আবার নূতন করে সবকিছু শুরু করার কথা ভাব। রূপ, অর্থ— কিসের অভাব তোর? তোকে পছন্দ করার ছেলেরও অভাব হবে না। শুধু শুধু সমীরণের কথা ভেবে সময় নষ্ট করছিস কেন?

— মা, তুমি কি যাবে না? কতোবার বলব আমার এসব কথা একদম ভালো লাগছে না।

মা চলে যাবার পর মায়ের বলা কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল রমার। মায়ের কথামতো যদি সত্যি সত্যি অতীতের কিছুটা মুছে দেওয়া যেতো, তাহলে বোধহয় কোনো সমস্যা থাকতো না। কিন্তু জীবনতো সাদা কাগজে পেনসিলের আঁচড় কাটা নয়, যে ইরেজারের ঘসায় উঠে যাবে! আর আঁচড়ের রং উঠে গেলেও দাগ থাকবেই। তার জীবনের এই দাগের কথাগুলোতো মা বোঝে না। ডাক্তার সান্ন্যালের একান্তে বলা কথাগুলোর আসল মানে বোঝার পর আবার বিয়ে করার কথা ভাবাই যায় না। যে কারণে সমীরণ তার সমস্ত ভালোলাগার স্মৃতিগুলো ভুলে গিয়ে এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করা শুরু করতে

পারে, সেই ঘটনাকে অন্য কোনও পুরুষ মানুষ সহজভাবে নেবে— তার গ্যারান্টি কোথায়? আর নিজের অক্ষমতা জানার পর কাউকে বিয়ে করা মানে তো তাকে ঠকানো। সারাজীবন একথা লুকিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করাও তো চরম যন্ত্রণার।

— দিদিমণি, জলখাবার রেখে গেলাম।

— না, তুই নিয়ে যা। আমি কিছু খাবো না।

এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে আবার আগের চিন্তাতেই ফিরে গেল রমা। কোর্টের রায়ে কেস জেতায় কি জেতা হল তা বুঝে উঠতে পারছিল না সে। অথচ এরজন্যেই সমীরণের মাকে অকারণে অত্যাচারী সাজানোর নাকি প্রয়োজন ছিল! কোনো সাতেপাঁচে না থাকা একজন মানুষকে সবার সামনে ছোট করে কিই বা পাওয়া গেল! মাঝখান থেকে সমীরণের সঙ্গে একসাথে পাওয়া আনন্দের স্মৃতিগুলোকেও এখন অনধিকার চর্চা ভেবে ভোলার চেষ্টা করতে হবে, এটাই সবার দাবি। কলেজের সাইকোলজির প্রফেসর শুভ্রকান্তবাবুর কিছু কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল রমার। পুরুষ-পৌরুষ-ইগো — এসবের একের সঙ্গেঅন্যের সম্পর্কের ব্যাখ্যা যেন এতোদিন সত্যি সত্যি বোঝা গেল। আজ— এতদিন পরে রমার মনে হতে লাগল —হয়তো সমীরণেরও রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। দুর্ব্যবহার হয়তো ছিল সেই রাগেরই প্রকাশ।

— দিদিমণি, তোমার ফোন, ধরে আছে।

— বললাম না, বাড়ি নেই বলে দিস্। কে ফোন করেছে?

— জামাইবাবু।

হারুর মায়ের কথায় শক্ খাওয়া মানুষের মতো রমা চমকে উঠল। হারুর মায়েদের কাছে বোধহয় ডিভোর্স-খোরপোষ—এসবের কোনো মানে নেই। সমীরণ কি বলতে চায় তা বুঝতে না পেরে টলতে টলতে রমা গিয়ে ফোন ধরল।

— হ্যালো, রমা?

— বলছি।

— শোনো, তোমার শাড়ি-জামাকাপড় আর গহণাগুলো আজ-কালের মধ্যে নিয়ে যেও। পরশু থেকে আমি থাকছি না।

— কোথায় যাবে?

— দিল্লী। যাক্ ওসব খবর জেনে কোনও লাভ নেই। তুমি নিজে এসে নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমিতো ঠিক জানিও না কোথায় কি রাখা আছে। আর মা তো ওসব চেনেও না।

— ওসব কথা থাক। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, আজকেই। কোথায় যাবো?

— আমার সঙ্গে কথা? ... আচ্ছা, যাইহোক, তাহলে তুমি সেন্ট্রাল পার্কের গেটে বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছে যেও।

— ঠিক আছে। অবশ্যই আসবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। ❑

উত্তরণ

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

মেয়ের ভোরবেলায় ঘুমভাঙ্গা চোখে মাকে দেখতে না পাওয়ার অভিমানের অন্যমনস্ক কৈফিয়ৎ দিতে দিতে নিজেকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছিল পরমা। অভিজিতের কাছ থেকে রিন্টিকে কোলে নিয়ে আদর করতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। অভিজিতের সঙ্গে কাল রাতের বচসা, ভোর রাতে হাসপাতাল থেকে ফোন পেয়ে আসা, হঠাৎ করে পাওয়া ডায়েরীর পড়া কথাগুলো নিজের জীবনে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়ে যাওয়া আর যে মহিলাটিকে অসহ্য গায়ে পড়া বলে মনে হত, তাকেই নিজের আসল মা বলে জানা—এ সব কিছুই যেন পরমার মাথার মধ্যে এক সঙ্গে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটমাসী, মেসো আর রবিমামার ডানার আড়ালে বড় হতে গিয়ে, কিংবা অভিজিতের সঙ্গে এই কয়েক বছরের নিস্তরঙ্গ, আটপৌরে জীবনে অভ্যস্ত হতে গিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতময় বাস্তব দিকটা তেমনভাবে অনুভব করার সুযোগ তার হয়নি। ঘটনাক্রমের আকস্মিতায় আর গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে জমে থাকা উদ্বেগে পরমা কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল, আর আস্তে আস্তে কথার বলার ইচ্ছে বা ক্ষমতাটাই তার চলে যাচ্ছিল। শারিরীকভাবে করে যাওয়া কাজগুলোর, মাসী-মেসোর বোঝানোগুলোর, এমনকি রিন্টির কথাগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না পরমার মস্তিষ্কে। নির্বাক চলচিত্রের সাদা-কালো ছবির মতো চোখের উপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছিল সমস্ত ঘটনা। এতপর সারাদিন হাসপাতাল-পুলিশ-শ্মশান—এই করতে করতে কখন যে গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ী ফিরতে, তার কিছুই টের পেল না পরমা। বাথরুমের শাওয়ারের জল গায়ে পড়তেই যেন চমক ভাঙল পরমার। আস্তে আস্তে ভাঙল তার আবেগের বাঁধও। চোখের নোনতা জল মিশে গেল স্নানের জলের সঙ্গে, আর আস্তে আস্তে বাস্তবে ফিরে আসতে লাগল পরমা। গত কয়েক মাসের সমস্ত ঘটনা যেন এক স্বপ্নের ঘোরে দেখা কিছু দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল তার। অথচ এই মুহূর্তে নিজের অবস্থাটি বুঝতে গিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য নানান পরিস্থিতির কথা তার মনে হতে থাকল। সেই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থানটা কোথায়—এই চিন্তা করতে গিয়ে কোন আলোর দিশা খুঁজে পাচ্ছিল না পরমা। কেমন চরিত্রের মহিলা ছিলেন তার জন্মদাত্রী? কোন পাপের ফসল হিসে কি তার এই পৃথিবীর আলো দেখা? না হলে কেন নিজের সত্যি পরিচয়ে বড় হওয়ার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না! ছেলেবেলার তিন মাস বয়সে মায়ের মৃত্যু বা তার কয়েক মাস পরে বাবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু—এসব গল্পের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? কার পাপ ঢাকতে? ছেলেবেলা থেকে যা জেনে এসেছে, সবই মিথ্যে! কোন এক অবৈধ সম্পর্কের, এক লজ্জাকর পাপের ফসল হিসাবে নিজেকে ভাবতে গিয়ে ঘৃণায় সারা শরীর শিউরে উঠল পরমার।

বাথরুমের দরজার দুম দুম শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল পরমার। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করে সে দেখল ছোটমাসীর উদ্বিগ্ন চোখ। ছোট করে 'আসছি' বলে দরজা বন্ধ করে সাওয়ার বন্ধ করল। ভেজা শরীর শুকনো করতে করতে পরমার মনে হল ছোটমাসীরা

তাকে নিয়ে কতোটাই না উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতা তো অভিনয় নয়, অকৃত্রিম ভালোবাসার থেকেই এর জন্ম। নিজেদের সন্তান নয় জেনেও তাকে সন্তানের পরিচয় দিয়ে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী ভালোবাসা দিয়ে বড় করা—এ তো শুধু দুশ্চরিত্রা দিদির পাপের ফসলকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ববোধ থেকে আসতে পারে না। নিজের মা-বাবা নয় জেনেও মাম বা বাবাইকে বাবা-মায়ের থেকে অন্যকিছু ভাবার কোন সুযোগই হয়নি কোন দিন। রবিমামা, ছোটমাসী বা মেসো—এদের এত ভালোবাসা পাওয়া, আর নিজের আসল মায়ের ছেলেবেলাতেই তাকে ফেলে চলে যাওয়া—এই দুটোর তুলনা মনে এসে চোখ দুটোকে আবার ভিজিয়ে দিল। চোখমুখ মুছে ফেলে স্বাভাবিক হওয়ার চূড়ান্ত চেষ্টা করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে পরমা দেখল অভিজিত দু'হাতের তালু মুড়ে কপালে ঠেকিয়ে কনুই দিয়ে টেবিলে ভর রেখে ঝুঁকে বসে আছে চেয়ারে। ছোটমাসী এসে পিঠে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে পরমাকে বসাল চেয়ারে। মেসো ছেলেবেলা থেকে পরিচিত সেই পুরাণ ভঙ্গীতে একটু ঝুঁকে হাতদুটো পেছনে মুড়ে ব্যালকনিতে পায়চারী করেই চলেছে। পরমার মনে হল কোন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেন সবাই ঘোরাফেরা করছে, আর সেই দুঃস্বপ্নের সবটাই তাকে ঘিরে। রিন্টিকে বোধহয় ছোটমাসী খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ছোটমাসীর চাপাচাপিতেও এক গ্লাস জল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে পারল না পরমা। তারপর ঘরের মধ্যে শুধু নির্বাক কিছু মুহূর্ত। অবশেষে অস্বস্তিকর সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল মেসোর কথায়।

—রমা, কিছু কথা তোকে আমাদের বলার আছে। কাল রাতেই বললে হয়তো ভালো হত, তবে ব্যাপারটা কিভাবে নিবি ভেবে বলতে পারিনি। এখন তো আর না বললেই নয়। তোর মা তোর ছেলেবেলায় মারা যায়নি। তবে...

মেসোর কথার মধ্যে বাধা দিল ছোটমাসী।

—কি সব বলছ এখন? এসব কথা সহ্য করার মতো অবস্থাতে ও আছে কি? এত তাড়াহুড়োর কি আছে। পরে সব জানলেই হবে।

পরমার কিছু শুনতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া লাল ভেলভেটে মোড়া ডায়েরীটার কথা তো ছোটমাসীরা জানে না। কারোর কাছ থেকে আর কিছুই জানার ইচ্ছে নেই পরমার। ছোটমাসীর কথায় অন্যমনস্কতা কেটে গেল তার।

—রাত হচ্ছে, আমরা এবার আসি রমা। কাল তো রবিবার, সকালে এসে কথা-বার্তা বলা যাবে। তোরা এখন একটু ঘুমোনোর চেষ্টা কর।

ছোটমাসীদের বেরিয়ে যাবার পর বিছানার মধ্যে কোন রকমে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল পরমা। নাইট-ল্যাম্পের হালকা সবুজ আলোয় ভরে ছিল গোটা বেডরুম। ডান হাতের তালুর পেছনটা উঠে এসেছিল দুই ভ্রূর মাঝখানে। সারাদিনের নানান ঘটনার ভিড় সব যেন হঠাৎ করে চলে গেছে মস্তিষ্ক থেকে। একটা শুন্যতা ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই অনুভূতির জগতে। বন্ধ চোখের সামনে শুধু কালো রঙের কিছু বুদবুদ তৈরী হয়ে আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিচিত্র জ্যামিতিক আকারের কিছু বস্তু মাঝে মাঝে চোখের সামনে জন্মে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় থাকার পর কিছুটা সম্বিত ফিরে

এল অভিজিতের দেশলাই জ্বালানোর শব্দে। আলতোভাবে চোখ খুলে পরমা দেখল অভিজিত একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অন্যমনস্ক হাতে সিগারেটে টোকা মেরে চলেছে। একবার কিছু বলার জন্য পরমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোন এক অজানা অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে আবার ধোঁয়া নিতে থাকল। পরমা অনুভব করল তার, রিন্টির আর অভিজিতের এই যে সম্পর্কের বৃত্ত, আলাদা করে যেখানে কোনদিন নিজের কোন অস্তিত্বের কথা মনে হয়নি, তা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। অনিশ্চয়তার, অজানা ভয়ের একটা ছায়া যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। নিজের ভবিষ্যত, রিন্টির ভবিষ্যত অথবা নিজের হাতে সাজান এই সংসারের ভবিষ্যত — সবই যেন তালগোল পাকানো, এক অনিশ্চয়তার মোড়কে মোড়া। দু-চোখ বন্ধ করে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পরমা অনুভব করল ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া নিজের কপালে। চোখ খুলে দেখল অভিজিত পাশে বসে আছে। পরমা ধীরে ধীরে উঠে বসল। অভিজিতের আকর্ষণে বুকে মুখ রাখতেই পরমা হারিয়ে ফেলল সমস্ত সংযম। সারাদিনের সমস্ত রুদ্ধ আবেগ বেরিয়ে এল কান্না হয়ে। এতোদিন ধরে নিজের বোঝার, নিজেকে বোঝানোর খেই খুঁজে না পাওয়ার চিন্তার জটিলতার মধ্যে খুঁজতে থাকা উদ্বেগ মুক্তির পথ, চিন্তার ভার কমানোর পথ সে পেয়ে গেল পিঠের ওপর অভিজিতের দেওয়া আলতো কয়েকটা চাপড়ানো থেকে। সমস্ত আবেগই এক সময় তীব্রতা হারায়, অভিজিতের স্যান্ডো গেঞ্জী আর বুকের লোম অনেকটাই ভিজিয়ে দেওয়ার পর পরমা কিছুটা ধাতস্থ হল।

পাশে শুয়ে আলতো হাতে পরমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে অভিজিত পরমাকে আরো খানিকটা সামলে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিল, তারপর মৃদু স্বরে বলতে শুরু করল,

—দ্যাখো রমা, মানুষের জীবনের এমন এক একটা দিন আসে, যখন তার ছেলেবেলা থেকে জানা পরিবেশ, চেনা পৃথিবী হঠাৎ করে অচেনা হয়ে যায়। মনে হয় যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। সে সময় মানুষের চেতনা, বোধ, বুদ্ধি—সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। আজ আমাদের জীবনের সেই রকম একটা দিন। তোমার মায়ের পরিচয় আর মৃত্যু নড়িয়ে দিয়ে গেছে তোমার জীবনের ভিত, আর আমার জীবনের উপলব্ধির ভিতটাও আজ নড়ে গেছে। তবু বলছি, স্থির হও, এতো উতলা হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি।

—উতলা হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি?

—না ঘটেনি। আসলে তুমি ঘটনাগুলোকে কিভাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করবে তার ওপর সবকিছুই নির্ভর করে। আমরা অধিকাংশ সময় কোনকিছুর বিচার করতে গিয়ে তার সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা তৈরী করে নিয়ে পরে বিচার করতে বসি। সেজন্য বাকী সবকিছুকেই তোমার মূল্যহীন মনে হবে, নিজেকে মনে হবে অস্পৃশ্য কোন জীব। মাকে পাপী মনে করলে তোমার মনে জমে থাকা ঘৃণা পাপী মায়ের স্মৃতি হয়ে ছায়ার মতো তোমাকেই সারাটা জীবন অনুসরণ করে চলবে।

—কিন্তু রিন্টি! ও যখন আমার পরিচয় জানবে, আমাকে ঘৃণা করবে, নিজেকে অপবিত্র মায়ের সন্তান মনে করে বাঁচবে?

—দেখো রমা, মা, বাবা, সন্তান আর সমাজ—এই ব্যাপারগুলোকে একসঙ্গে গুলিয়ে

ফেলো না। সব সন্তানই তার মা-বাবার কামজ সন্তান। সমাজ কাউকে বৈধ, কাউকে অবৈধ ঘোষণা করলেই কোন সন্তানের জন্ম রহস্য তাতে কিছুমাত্র বদলায় না। তাই নিজের জন্মের জন্যে তো কেউ দায়ী হতে পারে না। রিন্টির জন্মানোটা যদি কোন ঘৃণ্য ব্যাপার না হয়, তাহলে তোমার জন্মানোটা ঘৃণ্য হবে কেন?

—কিন্তু অতীত তো কোনদিন পিছু ছাড়ে না।

—না ছাড়ুক, তবু অতীত অতীতই। অতীতের যন্ত্রণাকে ঘাটাঘাটি করেই বা লাভ কি রমা? এতে তো বর্তমানটাই কেবলমাত্র বিষিয়ে যায়, এ ছাড়া কিছুই হয় না। আর তোমার অতীত খুব খারাপ কিছু বলেই বা মনে করছ কেন?

—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না ঐ মহিলার, মানে আমার মায়ের কথা। জন্ম দেওয়ার পর কি আমার প্রতি কোন দায়িত্ব ছিল না ওনার? তারপর কোন এক সরোজের মা বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা, এটাকেও কি তুমি স্বাভাবিক বলবে?

—তোমার মা আমার বন্ধু সরোজের মায়ের সহকর্মী ছিলেন এক সময়। সেজন্যই বোধ হয় সরোজের জীবনটাকে নিজের সন্তানের জীবন বলে অন্যদের সহজে বোঝাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এছাড়া ওনার কিই বা আর করার ছিল বলতে পারো? পরিচয়হীনা হলে এই হতভাগা দেশে একজন বয়স্কা মহিলার বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই জোটে না। আর তোমার প্রতি কর্তব্য? তুমি ওনাকে সোনাগাছির মেয়েদের স্বনির্ভর করার জন্য গান শেখাতে দেখেছো। এছাড়াও ঐসব মেয়েদের বাচ্চাদের সুস্থ পরিবেশে রেখে শিক্ষিত করার জন্য একটা সংগঠন গড়ে তুলছেন উনি, আর হয়ে উঠেছেন তাদের 'বড়দি'। এতো মহৎ মনের মানুষ নিজের সন্তানের প্রতি দায়িত্বটুকু অস্বীকার করবেন বলে তোমার মনে হয়? এই যে তুমি পরমা, সুশিক্ষিতা, গৃহিণী, মা—তোমার জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতি পাওয়ার কোন সুযোগ কি আমাদের সমাজ কোন কুমারী মায়ের সন্তানকে দেয়? তুমিও তো মা, বোঝ না নাড়ির টান কি জিনিস। তোমার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য উনি সেই টানটাকেও অস্বীকার করার চেষ্টা করে গিয়েছেন সারাজীবন।

—কিন্তু এতোটা বয়স পর্যন্ত তো ওনাকে আমি কোনদিন দেখতে পাইনি।

—রমা, এতোটা বয়স পর্য্যন্ত তোমার কাছে ওনার কোন অস্তিত্ব থাকলেই কি তা ভালো হোত? কোন্ পরিচয়ে উনি তোমার কাছে আসতেন? মানুষ চিনতে আমরা সবাই প্রায়ই ভুল করি, তাই ঠকে যাই। পরে তা হয়ে যায় আমাদের অভিজ্ঞতার অঙ্গ। অথচ একইরকম একটা ভুলের মাশুল একজন মহিলাকে গুণে যেতে হয় সারা জীবন। মৃত্যুর পরেও সে মাশুল গোণা শেষ হয়ে যেতে চায় না।

—উনিতো আমার সামনে না এলেও পারতেন।

—হয়তো পারতেন, তবে শেষ বয়েসে পৌঁছে নিজের মেয়ে আর নাতনিকে দেখে বোধ হয় সামলাতে পারেন নি। হয়তো বা পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে সত্যটা তোমাকে জানাতে চেয়ে ছিলেন, আর সেজন্যই বোধহয় ডায়েরী লেখা শুরু করেছিলেন। আর তুমিও তো তখন বুঝতে পারতে না কেন এক অজানা-অচেনা মহিলাকে দেখে তোমার এতো অস্বস্তি

হত। নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে থাকা কথাটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়নি কোনদিন। আসলে ঐ মহিলার কম বয়সের মুখটিকে তুমি প্রতিদিন কতোবার দেখেছ আয়নায়, পরিচর্যা করেছ। আজ ওনার শেষযাত্রার সময় হঠাৎ করে আমার চোখে তা ধরা পড়ল।

—কিন্তু অভিজিত, তুমি যাকে ভুল বলছ তা পাপ নয় কেন?

—রমা, ভুল ভুলই। ভুল আমরা কে করি না বলতো? ইচ্ছাকৃতভাবে বার বার একই অন্যায় কাজ করলে তাকে তুমি পাপ বলতে পারো, কিন্তু ভুল মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকে যাওয়াটা কোন পাপ নয়। প্রথমে তোমার মায়ের কথা জেনে আমিও বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো যে পরিস্থিতিতে যেভাবে কথাগুলো শুনেছিলাম, তারও একটা প্রভাব ছিল। গতকাল একটু বেশী ড্রিঙ্ক করাও হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি কাল রাতে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তাতে নিজেই নিজের কাছে অনেক ছোট হয়ে গেছি। নিজেকে ঘেন্না লাগছে। তুমি রাতের পর রাত ঘুমোতে না পেরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছ, কি যন্ত্রণার মধ্যেই না এতোগুলো দিন কাটিয়েছ, আর আমি বিরক্ত হয়েছি। দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। দ্যাখো, মানুষের পরিচয় তো তার কোন একটা ভুলের মধ্যে নয়, তার পরিচয় মনুষ্যত্বে। ভাব তো পরিচিত সবাইয়ের থেকে দূরে চলে গিয়ে, সন্তানকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে করতে কিরকম যন্ত্রণার মধ্যে ওনার দিন কাটত। সমস্ত নীচতা থেকে দূরে থেকে নিজেকে প্রতিদিন ছাপিয়ে যেতে যেতে একদিন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের থেকে অনেক ওপরের স্তরের একজন মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা, এটা কম কথা নয়। জানি না উনি কোথা থেকে পেলেন এতো আত্মবিশ্বাস, তবে এই মায়ের মেয়ে হিসাবে তোমার গর্বিত হওয়া উচিৎ রমা। এইসব ফালতু কৌতুহলগুলোকে ঝেড়ে ফেলো, নিজের মনকে বোঝাও কার জীবনে কি কি ভুল বা মিথ্যে ছিল—এসব খোঁজ করার মতো নীচ মনের মানুষ তুমি নও।

—কিন্তু তোমার কাছে তো সারাজীবনের জন্য আমি ছোট হয়ে গেলাম।

—কেন ছোট হবে রমা, আর এরকমটা মনে করবেই বা কেন? তোমার মায়ের কথা ভেবে জীবনের এই সব প্রতিষ্ঠা, যা এতদিন ধরে অর্জন করেছি, সবই তুচ্ছ লাগে। একজন মানুষ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা না পেয়েও কতোকিছু করে যেতে পারেন! ভালো ক্যারিয়ার তৈরী করার দৌড়ে থেকে আমার ঘাড়ে চেপেছে আম্বিশনের ভূত। আর তার যমজ ভাই টেনশন জীবনটাকে করে তুলছে যন্ত্র। এভাবেই হয়ত সারা জীবন কেটে যেত, যদি না তোমার মায়ের মৃত্যু আমাকে নাড়া দিত। এতো ছুটোছুটি করে কি হতে পেরেছি? করাপশনে ভরা একটা সিস্টেমের নাট বা বল্টু। নিজের কথা ছাড়া অন্য কারোর কথা জীবনের কোনদিন ভাবিনি। রমা, সত্যি সত্যি কোনটা যে পাওয়া, কোনটা হারানো, বোঝা মুশকিল। তুমি নিজের মাকে পেলে আজ তাঁকে হারিয়ে, আর আমার প্রাপ্তিও কিছু কম নয়। দুঃখ করো না, আজ আমাদের আনন্দের দিন।

পরমা ভাবল মায়ের ডায়েরীর না পড়া পাতাগুলো অজানাই থাক। কাল সকালেই ওটা সে পুড়িয়ে ফেলবে।